শতবর্ষে

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির

স্বামী মুক্তীশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর ১৯০২ সালের জুলাই মাসের ‘ব্রহ্মবাদিন্’ পত্রিকায় ক্রিশ্চিনা অ্যালবার্স ‘A TRIBUTE TO VIVEKANANDA’ শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির দুটি ছত্রে রয়েছে স্বামীজীর ভাবী স্মৃতিমন্দির সম্বন্ধে এক কালজয়ী মূল্যায়ন :

‘‘জাতির করুণ অশ্রুধৌত তাঁহার স্মৃতিসৌধ,
ভাবীকালে হবে জগতের বুকে মহাপবিত্র তীর্থ।’’

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের সেই মন্দিরটি আজ শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। একশো বছরের যাত্রাপথের সে-ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণময়।

স্বামীজীর মহাসমাধি হল ৪ জুলাই ১৯০২, রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটে। দেহত্যাগের পর তাঁর মরদেহকে কোথায় অগ্নিসমর্পণ করা হবে, স্বামীজী নিজেই তার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। মঠপ্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গঙ্গাতীরের বেলগাছ-দেবদারু গাছ সংলগ্ন জায়গাটি স্বামীজীর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় সানন্দে ধূমপান করতে করতে ওখানে পাদচারণা করতেন। এইরকমই একদিন রাজা মহারাজকে বলেছিলেন, ‘‘রাজা, আমায় এখানে একটু জায়গা দিতে পারিস?’’ মহারাজ উত্তরে বলেন, ‘‘ভাই, তোমারই তো সব। তোমায় আবার জায়গা দেব কি?’’ আর একদিন স্বামীজী স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে মঠে পায়চারি করতে করতে ওই জায়গাটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘‘ঐ দেখ শরৎ, সামনেই ঠাকুরের চিতাস্মৃতি, আমার মনে হয় সমস্ত মঠভূমির মধ্যে এই স্থানটিই সর্বোৎকৃষ্ট।’’ দেহত্যাগের তিনদিন আগে বিকেলে স্বামীজী দক্ষিণদিকে বেলগাছের কাছে গঙ্গাতীরের একটি স্থানে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘‘আমার দেহ গেলে এখানে সৎকার করবি।’’

স্বামীজীর তিরোভাবের পরদিন সকালে ওইসব কথা সারদানন্দজীর মনে পড়ল। ওই স্থানটিই সৎকারের জন্য মনোনীত হল। স্বামীজীর স্থাপিত বেলুড় মঠের ভূমিতে সর্বপ্রথম স্বামীজীরই

সন্ন্যাসী, বেলুড় মঠ

পূতদেহের সৎকার হল। সিস্টার ক্রিস্টিনকে লেখা নিবেদিতার ৭ জুলাই ১৯০২-এর চিঠি থেকে জানা যায়, স্বামীজীর পবিত্র ভস্মাস্থি ঠাকুরমন্দিরে রাখা হয়েছিল।

মহাসমাধির দিন স্বামীজী কালীপূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাই পরবর্তী অমাবস্যার রাতে, ৩ আগস্ট ১৯০২ মঠে কালীপূজা হয়েছিল। ভোর ৩টের পরে মঠবাড়ির পশ্চিমদিকের দালানের সামনে বৃহৎ হোমকুণ্ডে হোম শুরু হয়। হোম শেষ হলে যেখানে স্বামীজীর দেহ অগ্নিসংস্কার করা হয়েছিল সেখানে সকলে গিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করে কিছুক্ষণ বেলতলায় বসে জপ করেছিলেন।

স্বামীজীর মরদেহের দাহকার্যের পর থেকেই স্থানটি বিশেষভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ শুরু হয়। মঠের অছি পরিষদের সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, পঁচিশশো টাকা ব্যয়ে সেখানে নাটমন্দির সহ একটি শিবমন্দির তৈরি হবে; এই টাকা স্বামীজীর অনুরাগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে। এই খবর দিয়ে সারদানন্দজী মিসেস ওলি বুলকে ২৪ জুলাই ১৯০২ লিখলেন, ''[স্থলটিতে] একখানি মন্দির এবং মধ্যে মধ্যে মঠে অভ্যাগত সাধুসকলের নিমিত্ত তৎসংলগ্ন একখানি বিশ্রামাগার নির্মিত হইবে।'' তিনি ৭ আগস্ট এই মর্মে অভেদানন্দজীকেও চিঠি দেন এবং স্বামীজীর আমেরিকান বন্ধুরা এই বিষয়ে কিছু সাহায্য করলে তা পাঠাতে লেখেন।

স্মৃতিমন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত ও দ্রুত উদ্যোগ ছিল স্বামীজীর প্রতি তাঁর গুরুভাইদের সুগভীর শ্রদ্ধাভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডায়রি থেকে জানা যায়, ২৮ জুলাই ১৯০২ গোবিন্দবাবু নামে জনৈক ভক্তের মাধ্যমে স্বামীজীর মন্দির আর নাটমন্দিরের প্ল্যান তৈরির জন্য বাগচীবাবু নামে এক ব্যক্তিকে চিঠি লেখা হয়।

কিন্তু স্বামীজীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে বেলুড় মঠ তথা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে ভিতরে ও বাইরে অনেক জটিল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেইসব সমস্যার কিছুটা সুরাহা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে মন্দিরের কাজ শুরু করতে প্রায় সাড়ে চার বছর লেগে যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অভেদানন্দজীকে লিখেছিলেন, ''মঠের কি রকম টানাটানি অবস্থা।... পোস্তা গাঁথা, ঘাট বাঁধান, স্বামীজীর মন্দির নির্মাণ, মঠের চারিদিকে দেওয়াল তৈয়ার প্রভৃতি কত কাজ অত্যাবশ্যকীয় হইলেও কোনটিতে হাত লাগানো হয়ে উঠছে না!''

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা তাঁর গ্রন্থের সর্বস্বত্ব মঠকে দান করেন স্বামীজীর মন্দির নির্মাণ তহবিলের জন্য। ত্রিগুণাতীতানন্দজী এজন্য ১৯০৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সারদানন্দজীকে মানি অর্ডার করে পঞ্চাশ টাকা পাঠান এবং ১৯২২-এ মায়াবতী আশ্রম দুহাজার টাকা শরৎ মহারাজকে দেন।

১৯০৭ সালের ১০ মার্চ স্বামীজীর মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হয়। তিনদিন পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী এলাহাবাদ থেকে এসে মন্দির নির্মাণের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। প্রায় এক বছরের মধ্যে একতলা মন্দির নির্মাণ শেষ হয়ে যায়। ১৯০৮ সালের উদ্বোধন পত্রিকায় স্বামীজীর জন্মোৎসব প্রতিবেদনে লেখা হল : ''মঠের দক্ষিণ দিকে একটি একতলা মন্দির নির্মিত হইয়াছে—তন্মধ্যে বেদী—তাহাতে স্বামীজীর বীরভাবোদ্দীপক মহান চিত্র। সম্মুখে নাটমন্দিরের ভিত্তি—এখানে শুনিলাম—জগতের জ্ঞানগর্ভ শ্রেষ্ঠগ্রন্থসমূহের এক বিরাট লাইব্রেরি ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মবক্তৃতার স্থান হইবে।'' এখন থেকে এই ক্ষুদ্র মন্দিরকে কেন্দ্র করে বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মতিথিপূজা ও উৎসবের দিনের উদ্দীপনা যেন নতুন মাত্রা পেল।

দেশজুড়ে স্বামীজীর আবির্ভাবের অর্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন শুরু হলে মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী 'Prabuddha Bharata' পত্রিকার (ডিসেম্বর ১৯১১) মাধ্যমে পাঠক, ভক্ত,

অনুরাগীদের কাছে স্বামীজীর মন্দিরের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন করেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক প্রবর্তিত পুনার বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'মরাঠা' পত্রিকায় ১৯১২ সালের ১৪ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মোৎসবের দিন আবেদনটি প্রকাশিত হয়। 'The Coming Semicentennial of Swami Vivekananda' শিরোনামের এই আবেদনে ব্রহ্মানন্দজী লিখেছিলেন, ''রামকৃষ্ণ মিশন একটি স্থায়ী স্মারক গড়তে চায় হাওড়া জেলায় তার প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে একটি মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে। এই মন্দিরে সংরক্ষিত হবে স্বামীজীর পূতাস্থি। তার সঙ্গে থাকবে একটি বৈদিক বিদ্যালয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মীয় গ্রন্থের একটি গ্রন্থাগার এবং সেইসব বিষয় আলোচনার জন্য একটি সমাবেশকক্ষ।''

ইতিমধ্যে যে-অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল তা মন্দিরের ভিত্তিনির্মাণের পক্ষেও অপ্রতুল—এটি উল্লেখ করে রাজা মহারাজ লিখলেন, ''স্বামীজীর পূতশরীরের দাহস্থানে যে-বেদি আছে তার আচ্ছাদন হিসাবে মাত্র স্বল্প উচ্চতার একখানি ঘর তৈরি করতে পারা গেছে। স্বামীজীর পূত অস্থি সাময়িকভাবে সংরক্ষিত আছে মঠের ঠাকুরঘরে।''

রাজা মহারাজ অকপটে লিখলেন যে, এর ফলে মন্দিরটি ভারতবর্ষের আত্মসম্মানের প্রমাণের বদলে তার 'কলঙ্কস্মারক' রূপে দাঁড়িয়ে আছে কারণ এতে প্রমাণ হচ্ছে, ভারতবাসী তার লোকান্তরিত আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। শুধু সমস্যা নয়, মহারাজ সমাধানের পথও বলে দিলেন। প্রস্তাবিত স্মৃতিমন্দির সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা প্রয়োজন ছিল। মহারাজ প্রস্তাব রাখলেন : ''যাঁরা স্বামীজীর অবদানের জন্য নিজেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী মনে করেন, তাঁরা ব্রত নিন যে তাঁরা স্বামীজীর জন্মের ৫০ তম বর্ষে নিজ মাসিক উপার্জনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথক করে রাখবেন এবং তা গুরুদক্ষিণারূপে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অথবা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজীর কাছে পাঠাবেন—প্রতিমাসে অথবা ১৯১২ সালের শেষে এককালীন—যাঁর যা সুবিধা। এমনকী মিশনের সমস্ত প্রকাশনা কেন্দ্র এবং বিশ্বের সর্বত্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কেন্দ্র বা বেদান্ত সমিতি বা এমন সব সংস্থার কাছেও পাঠানো যাবে যাঁরা স্বামীজীর আদর্শে তাঁর নামে অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন।''

এই আবেদন প্রকাশের প্রায় এক বছর পরও যে অর্থ এসেছিল তা আশানুরূপ ছিল না। ১৯১৩ সালের প্রবুদ্ধ ভারতের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় 'বিবেকানন্দ স্মারক মন্দির নির্মাণ তহবিল'-এর হিসাবে দেখা যায় যে মাত্র এক হাজার চুরাশি টাকা তিন আনা সংগৃহীত হয়েছে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' দাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আশাহত হয়ে লিখল, ''আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করেছি—সেই মানুষটি যিনি আমাদের জন্য প্রাণপণ খেটে গেলেন, যিনি দেশের উন্নতির জন্য এতকিছু করলেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় কত স্বল্প সংখ্যক মানুষ আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁদের সাধ্যানুযায়ী দান করেছেন।''

অনুদানকারীদের তালিকা দেখলে একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট হয়ে যায়—দাতারা ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। ভারতের মধ্যে যেমন বাঙ্গালোর, বেলগাঁও, বোম্বে, আহমেদনগর, দিল্লি, মাদ্রাজ, বাঁকিপুর, কলিকাতা, কুষ্টিয়া, শ্রীনগর; তেমনই সানফ্রাসিসকো, প্যারিস, বার্মা, নিউজিল্যান্ডের ডানডিন ইত্যাদি। দাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাদার সেভিয়ার, মিসেস ওলবার্গ (সানফ্রানসিসকো), ড. পি ভেঙ্কটরঙ্গম (বাঙ্গালোর), জেরাল্ড নোবেল (প্যারিস), প্রবুদ্ধ ভারত অফিস, নিউজিল্যান্ডের বেদান্ত গোষ্ঠী, রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ সোসাইটি প্রভৃতি।

মন্দির নির্মাণের শেষ পর্যায়েও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ঘটলে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে মঠ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন অর্থের জন্য প্রবুদ্ধ ভারত, বেদান্ত কেশরী, উদ্বোধন এবং আরও কয়েকটি পত্রিকায় আবেদন প্রকাশ করা হবে। স্বামীজীর মন্দির উদ্বোধনের পর ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে আবার এক আবেদনপত্র বের করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল অছি পরিষদের সভায়, মন্দির নির্মাণে ধার শোধ করার জন্য। তবে সম্ভবত তার আর প্রয়োজন হয়নি।

স্বামীজীর মন্দিরে স্থাপিত বাস-রিলিফ (bas-relief) মূর্তিটি তৈরি হয় স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা মিসেস বেটি লেগেটের অর্থে এবং ভগিনী নিবেদিতার উৎসাহে। ১৯১১ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নিবেদিতার লেখা চারটি চিঠিতে এইকালের ঘটনা আমরা জানতে পারি।

২০ এপ্রিল মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লেখেন, বেটির মনোমতো সমাধিমন্দিরের ফলক বানানোর উপযুক্ত ভাস্কর জয়পুরে আছেন। তবে কাজ করানোর জন্য ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে সেখানে পাঠাতে হবে, কারণ মিসেস হ্যারিংহ্যামের কাছে অজন্তা চিত্রাবলি নকলের সময় তাঁর যথেষ্ট শিল্পশিক্ষা হয়ে গেছে। যদি মিসেস লেগেট জানান যে কত বড় শ্বেতপাথরের প্যানেল তিনি চান (১ বা ১.৫ ফুট বা সামান্য বড়) তাহলে সেইমতো করাবার চেষ্টা করা হবে।

১২ জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা আবার লিখলেন, তাঁর আন্দাজ, শিল্পীর পারিশ্রমিক সহ সাতশো টাকা বা সামান্য বেশি খরচ হবে। ইতিমধ্যে তিনি রিলিফ মূর্তির মাপ জেনেছেন, তাই উচ্ছ্বসিত : ‘‘৩০ ইঞ্চি x ৩৬ ইঞ্চি প্যানেল তো বিরাট কাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে!!—এবং তা বিবেকানন্দ মন্দিরকে গৌরবময় ব্যাপার করে তুলবে, যা বহু যুগের বিখ্যাত ঘটনা হয়ে থাকবে।” ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি গণেন্দ্রনাথকে লিখলেন, ‘‘লন্ডন থেকে জেনেছি, ফ্রেম গোলাকার হবে, সমতল নয়। ওঁরা এখন বলছেন, তা হবে সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি চওড়া। আমি দ্রুত লিখছি—পাছে তুমি বেরিয়ে পড়ো।” একই দিনে মিসেস লেগেটকে লিখলেন, তিনি গণেন্দ্রনাথের থেকে জেনেছেন যে মূর্তিটি অনবদ্য হয়েছে, তবে সম্পূর্ণ হয়নি। শিল্পীর পারিশ্রমিক ছশো পঞ্চাশ টাকা আর গণেন্দ্রনাথের যাতায়াত ও জয়পুর বসবাসের খরচ, ফটো এনলার্জ করা, তার করা ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় আটশো টাকার মতো খরচ।

নিবেদিতা এই চিঠিতে স্বামীজীর মূর্তি খোদাইয়ের শিল্পীর এক অপূর্ব ভাবচিত্র তুলে ধরেছিলেন : ‘‘ভাস্কর কাজ আরম্ভ করেছিলেন প্রস্তরগত স্বামীজীর উদ্দেশে নৈবেদ্যসহ পূজামন্ত্র উচ্চারণ করে—‘হে স্বামীজী! আবির্ভূত হও আমার হাতে।’ সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত তিনি কাজ করেন, মাঝে খেয়ে নেন। জানিয়েছেন—যদি শেষ পর্যন্ত কাজটি সন্তোষজনক না হয়, তাহলে এক পয়সাও নেবেন না, সব টাকা ফেরত দেবেন।”

এই চিঠি লেখার আটদিন পরে ২২ সেপ্টেম্বর নিবেদিতা দার্জিলিং যাত্রা করেন এবং ১৩ অক্টোবর সেখানে তাঁর দেহাবসান হয়। এই মূর্তি তিনি দেখে যেতে পারেননি। তবে বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন দার্জিলিং থেকে তাঁর ভস্মাস্থি এনেছিলেন। তা বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দিরে রাখা হয়। আরও যাঁদের পূতাস্থি স্বামীজীর মন্দিরে স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন—গোপালের মা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মাস্টার মহাশয়, স্বামী সদানন্দ ও ঠাকুরের ভক্ত কালীপদ ঘোষের পুত্র বিবেকানন্দ-ভক্ত বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।

স্বামীজীর মন্দিরে বাস-রিলিফ মূর্তির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯১৩ সালের উদ্বোধন ও প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসবের সংবাদে। তবে মূর্তিটি অস্থায়ীভাবে বেদির উপরে স্থাপিত ছিল। মিস ম্যাকলাউড ১৯১৫ সালে

বেলুড় মঠে এসে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরটি প্রথম দেখলেন। তিনি ১৬ ডিসেম্বর ১৯১৫ একটি চিঠিতে জানালেন, ‘‘মূর্তিটি... বসানো হবে দেওয়ালের গায়ে; চার ইঞ্চি পুরু বালির কাজ করে তা করতে হবে; মর্মর প্রস্তরের ফ্রেমের যেটুকু গভীরতা, সেইটুকু দেওয়ালের সঙ্গে ব্যবধান থাকবে। ওঁরা রিলিফকে দেওয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে বসাতে পারলেন না, কারণ ওই দেওয়ালই হবে নতুন গ্রন্থাগার-ভবনের ভিত্তিপ্রাকার।’’

২৭ জানুয়ারি ১৯১৬ স্বামীজীর জন্মোৎসবের আগে এই মূর্তি স্থায়ীভাবে বসানো হয়েছিল। মূর্তিটি সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দজীর এক সংক্ষিপ্ত ভাবময় উক্তি : ‘‘স্বামীজীর এই মূর্তিটি বেশ, এলানে ভাব।’’

স্বামী নির্লেপানন্দজীর স্মৃতি থেকে জানা যায় ১৯২০ সালের ১৮ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথির সময়কালেও মন্দিরটি একতলা ছিল। ১৯১৯ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ডাকে বিজ্ঞানানন্দজী এলাহাবাদ থেকে স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের জন্য মঠে আসেন। কাজ শুরু হয়, কিন্তু জিনিসপত্রের অধিক দামের জন্য কাজ স্থগিত রেখে তাঁকে ফিরে যেতে হয়। পরের বছর আবার মন্দিরের কাজ শুরু হয়। ১৯২৩ সালে মঠ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন মন্দিরের দোতলায় ওঁকারের প্রতীকযুক্ত একটি বেদি তৈরি হবে এবং দোতলায় মন্দিরচূড়ায় বসানো হবে ত্রিশূল—স্বামীজীর শিবস্বরূপের কথা স্মরণে রেখে। বিজ্ঞানানন্দজীর প্রধান সহকারী ছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ। অত উঁচুতে উঠে চূড়ার উপর সোনার জল দেওয়া ত্রিশূলটি বসানোর ঝুঁকি নিতে মিস্ত্রিরা কেউ রাজি না হওয়ায় শঙ্করানন্দজী স্বয়ং মন্দিরের চূড়ায় উঠে ত্রিশূল বসিয়ে দেন। ১৯২৩ সালের শেষে সম্পূর্ণ হল স্বামীজীর মন্দির। শেষ পর্যায়ে বেদিতে নতুন করে মার্বেল বসানো হয়েছিল।

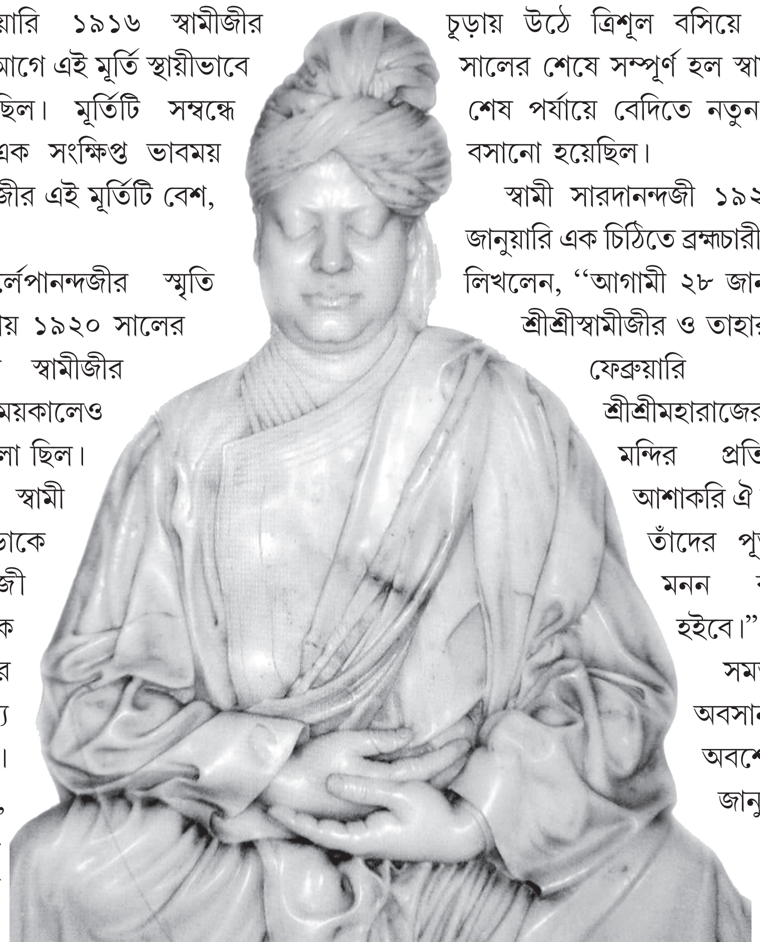

স্মৃতিমন্দিরে স্বামীজীর বাস-রিলিফ মূর্তি

স্বামী সারদানন্দজী ১৯২৪ সালের ৮ জানুয়ারি এক চিঠিতে ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্যকে লিখলেন, ‘‘আগামী ২৮ জানুয়ারি পূজনীয় শ্রীশ্রীস্বামীজীর ও তাহার নদিন পর ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মোৎসব ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। আশাকরি ঐ দিবসে তোমরা তাঁদের পূতচরিত্র স্মরণ মনন করিয়া ধন্য হইবে।’’

সমস্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ২৮ জানুয়ারি ১৯২৪ স্বামীজীর ৬২ তম জন্মতিথিতে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হল। প্রতিষ্ঠাকার্য

করলেন মহাপুরুষ মহারাজ। সকাল নটায় স্বামীজীর মন্দিরে বিশেষ পূজা আরম্ভ হয়। সারাদিন নানা যাগযজ্ঞ, পূজাপাঠ, হোম, ভজন-কীর্তন এবং বহু সহস্র দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন হয়েছিল। পুণ্যক্ষণে বিপুল জনতার সামনে মহাপুরুষ মহারাজ ওঁকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ওইদিন তিনি বলেছিলেন, ''স্বামীজী এখনও বেলুড় মঠে বাস করছেন। আমি কতদিন তাঁকে তাঁর ঘরে গভীর ধ্যানস্থ দেখেছি, কখনো দেখেছি তিনি পায়চারি করছেন।... একদিন বাবুরাম মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে সমাধিস্থানটি দেখিয়ে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, 'দেহত্যাগের পর আমার শরীর যেন এখানে দাহ করা হয়, আমি মঠেই থাকব।' " বেলুড় মঠ এই উপলক্ষ্যে কয়েকদিন উৎসব মুখরিত ছিল। সেদিন প্রায় পাঁচ-ছ হাজার মানুষ সমবেত হন এবং চার হাজার মানুষ প্রসাদ পান। বহু কিশোর-কিশোরী স্বামীজীর কবিতা আবৃত্তি করে স্বামী বোধানন্দজীর হাত থেকে পুরস্কার পায়। স্বামী অভেদানন্দজীও এক সমাবেশে ছোট্ট বক্তৃতা দেন।

পরদিন থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাদির ব্যবস্থা করা হল। তবে এর আগে থেকেই স্বামীজীর মন্দিরে পূজার সংবাদ পাওয়া যায় স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, প্রণবানন্দ, জ্ঞানাত্মানন্দ প্রমুখের স্মৃতিচারণে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একাদশতম অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজীও এক সময়ে এই মন্দিরে পূজা করেছেন বলে শোনা যায়।

স্বামী অপূর্বানন্দ লিখেছেন, স্বামীজীর পূতদেহ অগ্নিসাৎ করার অল্পদিন পরেই রাজা মহারাজ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে দিয়ে একটা নকশা করিয়ে সেই সমাধিভূমিতে প্রথমে একটি গর্ভমন্দির তৈরি করে নিত্য সেবাপূজাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। মঠের ঠাকুরঘরে রক্ষিত স্বামীজীর পূত ভস্মাস্থিতে প্রতিদিন পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হত। কবে থেকে ঠাকুরঘরে ঠাকুরের ছবির পাশে সিংহাসনে স্বামীজীর ধ্যানমূর্তি রাখা হল তার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। দাহস্থলে বেদিসহ একতলা মন্দির নির্মিত হওয়ার পরে—১৯০৮ সাল থেকে 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ জন্মতিথিপূজার যে-সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তাতে কেবল বেদির উপরে স্থাপিত স্বামীজীর প্রতিকৃতি ফুল দিয়ে সাজানোর কথা আছে।

স্বামীজীর মন্দিরে প্রথমে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি মন্দিরের প্রবেশপথের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে তৈরি হয়েছিল। তা এতই খাড়া ও সংকীর্ণ ছিল যে অনেকেরই পছন্দ হয়নি, বিশেষত মিস ম্যাকলাউডের। তিনি বলতেন, ''সিঁড়িগুলি খাড়া, সোজা, উঁচু আর সরু, যা স্বামীজী আর তাঁর শিক্ষার সঙ্গে একেবারেই বেমানান।" তাই তিনি ইঞ্জিনীয়ার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকারকে একটা 'চন্দ্রাকার' সিঁড়ি তৈরি করতে বলেন। গোপেন্দ্রকৃষ্ণবাবু সেটি বুঝতে না পেরে তাঁকে সিঁড়ির একটা স্কেচ করে দিতে বললে, ম্যাকলাউড ইতালির Villa d' Este-এর সিঁড়ির একটি নকশা করিয়ে এনে দেন। কাজ শুরু হয়েছিল আরও অনেক পরে। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মঠ কর্তৃপক্ষ পুরনো সিঁড়ির স্থলে নতুন সিঁড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ব্যয়ভার বহন করেছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দজীর ঘনিষ্ঠ আমেরিকান ভক্ত গ্লেন ওভারটন। এই নতুন 'চন্দ্রাকার' সিঁড়ি খুলে দেওয়া হয় শনিবার, ১৯ জানুয়ারি ১৯৫৭। সেদিন দলাইলামা, পাঞ্চেনলামা আসেন বেলুড় মঠ পরিদর্শনে। শিবানন্দজীর শিষ্য স্বামী মহাবীরানন্দের (গোপাল মহারাজ) তত্ত্বাবধানে এই নতুন সিঁড়িটি তৈরি হয়েছিল। এর ফলে দুদিকেই ষোলোটি ধাপ বেয়ে ওপরে ওঠা যায়।

১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে দোতলার বারান্দায় রেলিং লাগানো হয়েছিল। ১৯৩৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মন্দির, পোস্তা ও মূর্তি সংক্রান্ত বিবিধ

সংস্কারকাজ বারবারই করতে হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, এই মন্দির নির্মাণের জন্য মোট প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। এর মধ্যে দশ হাজার টাকা দেনা করে কাজ শেষ করতে হয়।

নানা সূত্র থেকে জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা হয়েছিল, এই মন্দিরের সঙ্গে থাকবে একটি শিবমন্দির ও নাটমন্দির, অভ্যাগত সাধুদের জন্য বিশ্রামাগার, লাইব্রেরি, সভাকক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ধর্মবক্তৃতার স্থান, এবং বেদবিদ্যালয়।

এসব সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময়ে নেওয়া হয়েছিল, ফলে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তখনও গৃহীত হয়নি। তবে স্বামীজীর মন্দিরের লাগোয়া হয়ে ওই প্রকল্পগুলি রূপায়িত না হলেও এই ব্যবস্থাগুলি অন্যরকমে মঠে প্রচলিত আছে। এর প্রধান কারণ হিসাবে একটিই তথ্য উঠে এসেছে—তা হল অর্থাভাব। এমনকী শেষে ঋণ করে মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। আমাদের অদ্ভুত লাগে। স্বামীজীর মহাসমাধির পর ভারতে জনমানসে তাঁর প্রভাব বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো আছড়ে পড়েছিল। যত দিন গেছে ততই দেশে বিদেশে স্বামীজীর ভাবের এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার ও প্রসার তীব্রতর গতি পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সভাসমিতি, সেবাকেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে। একদিকে তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিকরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করেছেন, সর্বস্ব ত্যাগ করে যুবকবৃন্দ দলে দলে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছেন, দেশে বিদেশে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও স্বামীজীর মন্দির যেন কোনও এক অদৃশ্য শক্তির বাধায় রূপায়িত হতে পারেনি।

স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরটি পশ্চিমমুখী, আটাত্তর ফুট ছয় ইঞ্চি উঁচু। গঠনশৈলীর দিক থেকে এটি একেবারে মৌলিক। একতলা মন্দির নির্মাণের পর থেকে কালক্রমে মঠের জমির উচ্চতা অনেক বেড়েছে। তাই দেখলে মনে হয় মন্দিরটি ভূমি থেকে হঠাৎ যেন খাড়া হয়ে উঠে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে মন্দিরের প্রচলিত স্থাপত্যরীতি থেকে ভিন্ন হলেও তা স্বামীজীর দৃঢ় ও ঋজু চরিত্রের সঙ্গে যেন মানানসই হয়েছে। মনে পড়ে একসময় স্বামীজী সম্পর্কে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর উক্তি : "স্বামীজী কী বলিষ্ঠ—কেমন খাড়া হয়ে ছিলেন। কারও উপর ঠেস দেওয়া, কারও recommendation-এর উপর আপনাকে জিইয়ে রাখা তাঁর ধাতে ছিল না।"

বেলুড় মঠে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির : সম্মুখদৃশ্য

স্বামীজীর মন্দিরের দোতলায় ওঙ্কার মন্দির

মন্দিরের বৈপ্লবিক স্থাপত্যচিন্তাকে মাথায় রেখেই বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর মন্দিরের নকশা ভেবেছিলেন। বলা চলে, স্বামীজীর মন্দিরই ছিল প্রস্তাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের অপ্রচলিত স্থাপত্যের প্রাথমিক পরীক্ষাগার। একই কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতিমন্দির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

মিসেস লেগেটের অর্থসাহায্যে গঙ্গায় পোস্তা বাঁধানো, পাশের জমি সমান করে নেওয়া হয়। তাই স্বামীজীর গর্ভমন্দির চারপাশ থেকে বেশ খানিকটা নিচু হয়ে যায়। উত্তর ভারতীয় 'নাগর' রীতির মন্দির-স্থাপত্যে গর্ভগৃহ থাকে উঁচুতে এবং উপযুক্ত সিঁড়িও গড়া হয়। মঠের মূল শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে সেরকমই দেখা যায়। অথচ স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরে সামগ্রিক পূর্বপরিকল্পনার অভাবে তার বিপরীতটাই ঘটল। এই বিশেষ ত্রুটিটিকে বিজ্ঞানানন্দজী অসাধারণ দক্ষতায় তার বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেন।

স্বামীজীর মন্দির ত্রিস্তর—নিচের তলায় স্বামীজীর রিলিফ-মূর্তি সহ মূল গর্ভমন্দির। তিনটি ধাপ বেয়ে নেমে আসতে হয় গর্ভগৃহে। দেওয়ালের গায়ে শ্বেতপাথরে মোড়া বেদি—স্বামীজীর পূতশরীরের দাহস্থান। বেদির ওপর স্বামীজীর রিলিফ মূর্তি দেওয়ালে গাঁথা, ওপরে সরু কাঠের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। মন্দিরের ছাদ অর্ধচন্দ্রাকৃতি—দুপাশে সামান্য আনত। মূল মন্দিরটিকে রক্ষা করতে তার চারপাশে আর একটি দেওয়াল তুলে তাকে আরও বেশি ভারবহনে সক্ষম করা হয়েছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই একটি অপরিসর নাটমন্দির আর পরিক্রমাপথ সৃষ্টি হয়েছে। নান্দনিক দৃষ্টিতে একতলাটি মোটের ওপর কারুকার্যহীন।

দ্বিতীয় স্তর দোতলায় ওঙ্কার মন্দির। স্বামীজীর মন্দিরটি তাঁর ভাবনার বাস্তব প্রতিফলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি মাদ্রাজে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমাদিগকে একটি মন্দির নির্মাণ করিতে হইবে—কারণ হিন্দুগণ সকল কাজেরই প্রথমে ধর্মকে লইয়া থাকে। তোমরা বলিতে পার, ঐ মন্দিরে কোন্ দেবতার পূজা হইবে—এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় বিবাদ করিতে পারে।... আমরা যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে, উহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে।... যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়গত ভাব অনুসারে ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে...। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদ-বাদী, এমনকি নাস্তিকগণ পর্যন্ত তাঁহাদের উচ্চতম আদর্শপ্রকাশের জন্য এই 'ওঁঙ্কার' অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন এই 'ওঙ্কার' মানবজাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাতিই উহা অবলম্বন করিতে পারেন।"

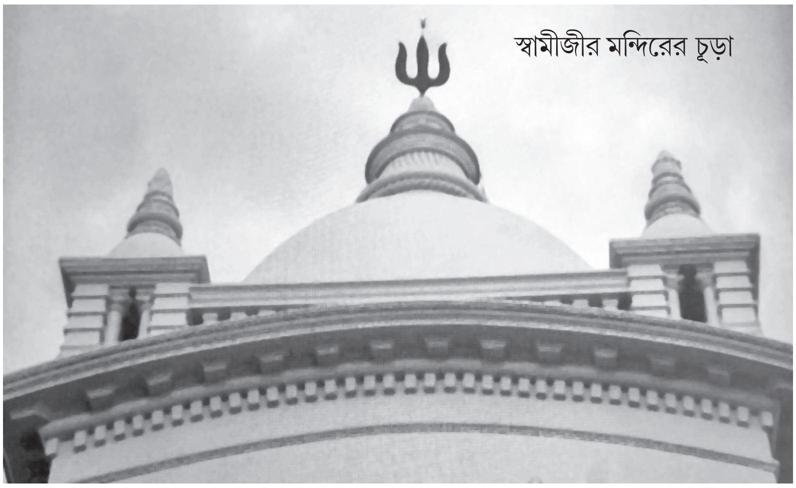
স্বামীজীর মন্দিরের চূড়া

স্বামীজীর মন্দিরের ছাদই হল ওঙ্কার মন্দিরের গর্ভগৃহ। সামনে সিঁড়ি বেয়ে সেখানে উঠতে হবে। 'নাগর' রীতির স্থাপত্যের ধারা বজায় রেখেই তা হল। ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির কেমন হবে সেই বিষয়ে স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীকে একসময় বলেছিলেন, ঠাকুরের বেদির উপরে থাকবে একটি ওঙ্কার। তাই স্বামীজীর গুরুভাইয়েরা স্বামীজীর মন্দিরের দ্বিতলে বেদির উপর স্থাপন করলেন সর্বধর্মের প্রতীক ওঙ্কার। দরজার উপরে খোদিত হল ওঁ চিহ্ন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর উদ্বোধন পত্রিকা এটিকে 'শ্রীবিবেকানন্দের ওঁকার-মন্দির' রূপেই বর্ণনা করল।

দোতলায় ওঙ্কার মন্দির তৈরির কয়েকটি প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, স্বামীজীর মন্দিরটি ক্ষুদ্র; তাকে মহিমামণ্ডিত সৌধতে রূপান্তরিত করার জন্য আর একটু উচ্চতা ও প্রশস্ততার দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত, গর্ভমন্দিরের ছাদ খোলা থাকলে স্বামীজীর শ্রীমূর্তির মাথার ওপর লোকে চলাফেরা করবে, সেটি বাঞ্ছনীয় নয়। তৃতীয়ত, স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী সর্বজনীন ভাবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করতে হবে। চতুর্থত, শাস্ত্রীয় নাগর শৈলীর মন্দির নির্মাণের কথা আগেই বলা হয়েছে।

মন্দিরের পূর্বদিকের দেওয়াল ঘেঁষে বেদির ওপর এক শ্বেতপাথরের কলসে প্রস্ফুটিত শতদল পদ্ম ও তার ওপর alabaster-এর ওঙ্কার। চারদিকে চারটি দরজা—যেন চারদিক থেকে সকলকে দরাজ মনে আহ্বান করা হচ্ছে এই বিশ্বজনীন ভাবে। স্বামীজী যে-সর্বজনীন ভাবের ওপর জোর দিতেন, তাঁর মন্দির সেই Universal Temple-এ পরিণত হল ওঙ্কার মন্দিরের মাধ্যমে।

এরপর মন্দিরটির তৃতীয় স্তর। এটি আদতে তার চূড়ার অংশ হলেও মন্দিরাকৃতি হওয়ায় বাইরে থেকে মনে হয় যেন তিনতলায় আর একটি ক্ষুদ্র মন্দির রয়েছে। বাস্তবে ওঙ্কার মন্দিরের ছাদটি প্যারাপেট ওয়াল দিয়ে ঘেরা; তার চারকোণে চারটি চূড়া। আরও ছোট চারটি চূড়া এবং আর একটি ছোট আকারের প্যারাপেট ওয়াল রয়েছে মাঝের মন্দিরাকৃতিটিকে ঘিরে। এগুলি ঘিরে রয়েছে মাঝের চূড়াটিকে যা আকারে সবচেয়ে বড় এবং মূল চূড়া। প্রধান ও বড় চূড়ায় রয়েছে বেঁকি, আমলক, কলস, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও তার ওপর ধাতব ত্রিশূল।

ওঙ্কার মন্দিরের ওপর প্যারাপেট-সহ সমতল ছাদ সমগ্র মন্দিরটিকে দালান মন্দিরের রূপ দেয় অথচ মাঝের মন্দিরাকৃতি শিখরটির গায়ে চালা-আকৃতির দ্বারা চালা-মন্দিরের ভাবও স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আবার তিনটি ধাপে নটি গম্বুজ বা চূড়া বসিয়ে নবরত্ন-মন্দিরের ভাবটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলার প্রধান তিনটি মন্দিরশৈলী—চালা, দালান ও রত্ন—সামান্য পরিবর্তিত আকারে হলেও, এই মন্দিরে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। সমন্বয়ভাবনার এও

এক ক্ষেত্র এবং পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণে এর সুষ্ঠু ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের বহিরঙ্গ অর্থাৎ facade খুঁটিয়ে দেখলে, দোতলার স্তম্ভগুলি ও খিলানের মাধ্যমে গ্রিক-রোমান ও হিন্দু-ইসলামীয় পঞ্চমুখী তোরণের উপস্থিতি জাতি-ধর্মের মিলনের ভাবটি স্পষ্ট করে।

স্বামীজী একসময়ে বলেছিলেন, ''আমি কোনদিন কর্ম হতে বিরত হব না। যতদিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছে, ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে থাকব।'' তাঁর স্মৃতিসৌধ সেই প্রেরণার অন্যতম স্থূল অবলম্বন। আজ ওই মন্দির স্বামীজীর বিরাট কীর্তির প্রতীকরূপে গঙ্গাবক্ষ আলোকিত করে দেশবিদেশের শত শত তীর্থযাত্রীর প্রাণে দিব্য অনুপ্রেরণা এনে দিচ্ছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মহাসমাধি হয় ১০ এপ্রিল ১৯২২। মিস ম্যাকলাউড ২৪ এপ্রিল তাঁর দিদির মেয়ে অ্যালবার্টাকে লিখলেন, ''ব্রহ্মানন্দজী চলে গেলেন। শনিবার (২২ এপ্রিল) দু-হাজার মানুষকে খাওয়ানো হল...। গঙ্গার পোস্তা আরও নব্বই ফুট বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর একটি মন্দির তৈরি করার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা।'' অর্থাৎ মহারাজের স্মৃতিমন্দিরের ভাবনা তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্বামী অপূর্বানন্দ শুনেছিলেন, মহারাজের দেহত্যাগের পরদিন যখন তাঁর পূতদেহ বলরাম মন্দির থেকে বেলুড় মঠে আনা হয়, তখনই তাঁর ভাবী স্মৃতিমন্দিরের বিষয়ে আলোচনা করে মহাপুরুষ মহারাজ সমাধিস্থানটি নির্ণয় করেন। জানা যায়, স্বামী সারদানন্দের আদেশে স্বামী শঙ্করানন্দ মন্দির নির্মাণের জন্য একটি স্থান পছন্দ করেছিলেন। সম্ভবত সেই স্থানটিই মহাপুরুষ মহারাজ অনুমোদন করেন।

রাজা মহারাজ বিভিন্ন জায়গা থেকে নানারকম গাছ এনে বেলুড় মঠে লাগিয়েছিলেন—শ্বেতচন্দন, পুন্নাগ, বংশীবট বা ঠোঙাবট, নাগলিঙ্গম ইত্যাদি। গঙ্গাতীরে তাঁর স্বহস্তরোপিত একটি কদমগাছের পাশে মহারাজ মাঝে মাঝে পায়চারি করতেন। তাঁর স্মৃতিপূত এই স্থানটিতেই তাঁর দেহের অগ্নিসৎকার হয়েছিল এবং পরে তাঁর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। অপূর্বানন্দজীর কলমে : ''ঐ অংশ খুবই অসমান ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।... মন্দির নির্মাণকার্যের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধার পরিষ্কার ও ভরাট করা হয় এবং মন্দির রক্ষার জন্য মন্দিরকে তিনদিক থেকে বেষ্টন করে গঙ্গার ধারে পোস্তাও নির্মিত হয়।'' জোয়ারের সময় কদম প্রভৃতি গাছগুলির গোড়াতেও গঙ্গার জল উঠে আসত বলে ৩০ এপ্রিল থেকেই মহারাজের সমাধিভূমির সামনে পোস্তার কাজ আরম্ভ হয়।

সে-বছরই ২৩ ডিসেম্বর মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। শিলান্যাস করেন মহাপুরুষ মহারাজ। মন্দির নির্মাণের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন রাজা মহারাজের শিষ্য স্বামী শঙ্করানন্দ। মহারাজের অপর শিষ্য স্বামী নির্বাণানন্দও ভুবনেশ্বর থেকে এসে কাজের তদারকি করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত নবগোপাল ঘোষের তৃতীয় পুত্র ব্রহ্মানন্দজীর আশ্রিত শ্যামসুন্দর ঘোষ এই মন্দিরের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং আরও বহুভাবে মন্দির নির্মাণে শঙ্করানন্দজীকে সাহায্য করেছিলেন।

মন্দিরের কাজ হয় দ্রুত। ১৯২৩-এর ৬ এপ্রিল পশ্চিমের খিলান, ৮ এপ্রিল মাঝের ও উত্তরের খিলান এবং ১০ এপ্রিল দক্ষিণের খিলানের কাজ হয়ে যায়। গম্বুজগুলির শীর্ষে বিষ্ণুচক্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ১ জুলাই চক্রের নকশা এঁকে জনৈক নরসিংহবাবুকে দেওয়া হলে তিনি একটি মডেল তৈরি করে দেন ১৪ জুলাই। হাওড়ার পঞ্চাননতলার কারক কোম্পানিতে ঢালাই করিয়ে

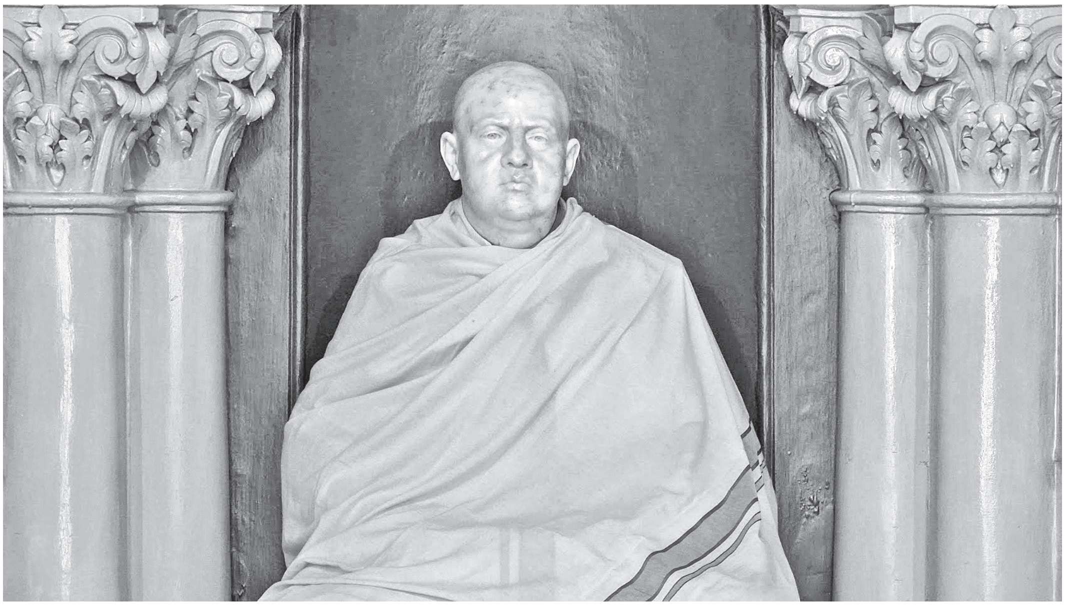

রাজা মহারাজের মন্দিরে তাঁর মূর্তি

সোনার জল দিয়ে বজ্রনিরোধকের সঙ্গে চক্রগুলি লাগানো হয় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। ১০ আগস্ট বেদির নকশা আঁকা হয়, মাপ নেওয়া হয় ৩ সেপ্টেম্বর। আগস্ট মাসে দরজা প্রভৃতি লাগানো হয়, ২০ অক্টোবর বেদির কাজ আরম্ভ হয়।

১১ জানুয়ারি ১৯২৪ মহারাজের মূর্তি তৈরি হয়ে আসে। ২২ থেকে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে বেদি ও পিছনের থামগুলির কাজ হয়ে যায়। ১ ফেব্রুয়ারি মূর্তি বসানো হল। তারপর বার্নিশ ও রঙের কাজ শেষ করা হল।

মহারাজের জন্মতিথির দিন—৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ (২৪ মাঘ ১৩৩০) তাঁর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা হল। পূজক ছিলেন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ। স্বামী অপূর্বানন্দ 'দেবলোকে' গ্রন্থে ওইদিনের বর্ণনা করে লিখেছেন, ''স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি উৎসবের দিন বিবিধ পূজানুষ্ঠানের পরে শত শত সন্ন্যাসী ও ভক্তমণ্ডলীর উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে, মহাপুরুষজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সমাধি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করে মহারাজের মানুষ-প্রমাণ (বসা) মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূর্তিটি এত সুন্দর যে, দেখে মনে হয় যেন মহারাজ জীবন্ত বসে আছেন। মন্দিরের দ্বিতলে মঠবাড়ি হতে আনীত মহারাজের ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র রক্ষিত হয় এবং সেদিন থেকেই ঐ মন্দিরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিত্যপূজাদি প্রবর্তিত হয়। সারাদিনই পূজা-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ, ভজনকীর্তন, ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে। সন্ধ্যার পরে মঠবাসী সাধুগণ মহারাজের মন্দিরে তাঁর প্রবর্তিত 'শ্রীরামনাম সংকীর্তন' গান করেন।'' রাতে কালীপূজা হয়েছিল, ভোর তিনটেয় পূজা শেষ হয়। সেদিন প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্তের জন্য প্রসাদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, অবশ্য উদ্বোধন পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রায় দু-হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা জানায়, আতসবাজি পোড়ানোর মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটেছিল।

কথামৃতকার 'শ্রীম' তাঁর পৌত্রীর অসুখের জন্য ওইদিন মঠে আসতে পারেননি কিন্তু তাঁর ভক্তদের পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা সারাদিন উৎসবের কাজ করে মঠেই রাত্রিবাস করেন।

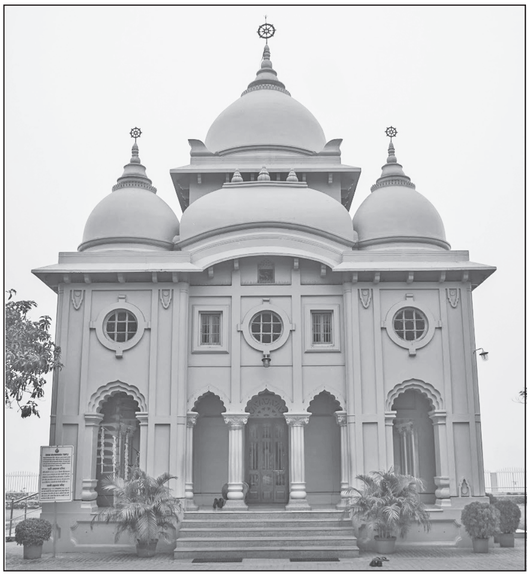

রাজা মহারাজের মন্দির : সম্মুখদৃশ্য

রাজা মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র বলে মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরের গর্ভমন্দিরের নকশাটিকেই মহারাজের মন্দিরের নকশারূপে স্থির করেছিলেন।

মহারাজের মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই—৩২ ফুট ৬ ইঞ্চি; উচ্চতা ৩০-৩৫ ফুট। গর্ভমন্দির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ২৩ ফুট, তার চারদিকে শ্বেতপাথরের পরিক্রমা ৮ ফুট প্রশস্ত। গর্ভমন্দিরের মেঝে শ্বেতপাথরের, ভিতরের দেওয়াল পাথরের, ৩.৫ ফুট উঁচু। ৬ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২.২৫ ফুট প্রস্থের একটি বেদির ওপর আর একটি ৩.৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১.৫ ফুট প্রস্থের বেদি। মহারাজের বেদির সামনের দুই কোণে দুটি স্তম্ভ, ওপর আর নিচের প্রান্তভাগে ফুলের পাপড়ি এবং ওপরের তলটি আলপনাযুক্ত। তার ওপর মহারাজের শ্বেতপাথরের পশ্চিমমুখী মূর্তি। এটি তৈরি করেন কুমোরটুলির পাল পদবিধারী জনৈক ভাস্কর। স্তম্ভদুটির সংযোজক অর্ধগোলাকার বেষ্টনীর ওপরে ফুলদানিসহ লতাপাতাফুলের সুন্দর নকশা। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মোট ছটি কুলুঙ্গি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর কৃষ্ণসখারূপে দর্শন করেছিলেন। আবার ঠাকুর তাঁকে সাক্ষাৎ 'গোপাল' জ্ঞান করতেন। সেজন্য মহারাজের বিগ্রহের নিচের শ্বেতপাথরের বেদিতে সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল মূর্তি স্থাপিত।

মহারাজের মন্দির দোতলা। গর্ভমন্দিরের ওপর প্রধান গম্বুজ। পরিক্রমার প্রান্তভাগের স্তম্ভগুলি নকশাদার আর্চ দ্বারা যুক্ত। স্তম্ভগুলি লাল সিমেন্টের, স্তম্ভমূলের অংশগুলি লাল-সাদা মোজাইক করা। চারদিকে পাঁচটি করে মোট আর্চের সংখ্যা কুড়িটি। প্রধান গম্বুজ ও অন্যান্য গম্বুজের মধ্যে চারচালা মন্দিরের মতো চারটি চাল। প্রতি গম্বুজের শীর্ষে বেঁকি, আমলক, কলস। গম্বুজগুলিকে বেষ্টন করে দ্বিস্তর অলংকরণ শতদল পদ্মকে মনে করিয়ে দেয়। তার ওপর সুদর্শনচক্র। প্রধান গম্বুজের চারকোণে পাপড়ির মতো চারটি ঊর্ধ্বমুখ অংশও প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করেছিলেন, প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরে রাখাল নৃত্যরত। মন্দিরটি দেখলে সেকথাই মনে আসে। পশ্চিমমুখী মন্দিরটির প্রধান দরজা ছাড়া উত্তর-দক্ষিণে আরও দুটি দরজা। মন্দিরে ওঠার জন্য উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সিঁড়ি।

দোতলায় মহারাজের শয়নঘরে তাঁর ব্যবহৃত খাট-বিছানা প্রভৃতি আসবাবপত্র রক্ষিত আছে। ওপরে ওঠার জন্য উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।

মহারাজের মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, ''মহারাজের দেহত্যাগে মঠ যেন শূন্য মনে হত। মঠের আধ্যাত্মিকতা, এমনকি গাছপালা পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছিল। এখন মহারাজ মঠেই বাস করছেন, মঠ আবার জেগে উঠবে। যারা মন্দিরে মহারাজকে দর্শন করবে তাদেরও মহারাজ আশীর্বাদ করবেন, আর মন্দিরে বসে আমাদের সকলের দেখাশুনা করবেন। মহারাজ না থাকলে কি মঠ মানায়?'' ✠